

মানুষের উদ্ভব কি কোন স্বর্গীয় স্পর্শের ফসল?

বন্যা আহমেদ

ধরুন, দেড় দুই লক্ষ বছর আগে কোনো এক বুদ্ধিমান মহাজাগতিক প্রাণী, আমাদের কল্পনার সেই ‘উড়ন্ত সসারে’ করে পৃথিবীতে পদার্পণ করল। সেই সময়ে আফ্রিকার এক কোণে ঘুরে বেড়ানো আমাদের আধুনিক মানুষের প্রজাতি *Homo sapiens* দের দেখে কী ভাবতো তারা? তারা কি বিবর্তনের পরিক্রমায় এই পৃথিবীতে আমাদের টিকে থাকা নিয়ে কোন বড়সড় বাজি ধরতে রাজি হত? তারা কি ভুলেও কল্পনা করতে পারতো যে এই প্রজাতিটিই খুব নিকট ভবিষ্যতে সারা পৃথিবীটাকে দখল করে নেবে? চারদিকের নির্মম প্রকৃতির সাথে টেকা দিয়ে টিকে থাকার জন্য কী আছে তাদের? প্রয়োজনীয় কিছুই নেই – খাবা নেই, ধারালো দাঁত নেই, শিং বা লোম কিছুই নেই, অত্যন্ত দুর্বল দেখতে অদ্ভুত এক দ্বিপদী প্রাণী! জানি, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর মতই শোনাচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটাকে ঠিক উড়িয়েও তো দেওয়া যায় না। এখন তাহলে প্রশ্ন করতে হয়, সে অবস্থা থেকে আমরা টিকে গেলাম কী করে?

শুধু টিকে গেছি বললেও তো ভুল বলা হবে – মাত্র দেড়-দুই লাখ বছরে ফুলে ফেপে সংখ্যা ছয়শো কোটি তো ছাড়িয়ে গেছিই, পৃথিবীব্যাপী প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করছি, ইদানীংকালে আবার পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে মহাবিশ্বের দিকেও দিয়েছি হাত বাড়িয়ে। কিন্তু কী করে সম্ভব হল সেটা? বৈচিত্র্যময় এই বিশাল প্রকৃতিতে আমরা কি আসলেই অনন্য? এর উত্তর তো সোজাসাপটা ‘হ্যাঁ’ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। মানুষ এই প্রকৃতিরই অংশ, অন্যান্য প্রাণীর মতই লাখ লাখ বছর ধরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায়ই তার উৎপত্তি ঘটেছে। কিন্তু বিবর্তনের এই প্রক্রিয়াতেই মানুষের মধ্যে অনন্যসাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটেছে যা প্রকৃতিতে সেভাবে আগে কখনও ঘটেনি। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় যে কী ধরনের অভিনব এবং জটিল বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি ঘটতে পারে তারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছি আমরা। বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক স্টিভেন পিঙ্কার* এক সাক্ষাৎকারে মজা করে বলেছিলেন,

‘ছট করে দেখলে মানুষের বিবর্তনকে তো অসাধারণ বলেই মনে হয়। যে পদ্ধতি থেকে শামুক, বট গাছ বা মাছের মতো জীবের জন্ম হয় তা থেকেই কী করে আবার চাঁদে পৌঁছে যাওয়া, মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়া বা ইন্টারনেটের জন্মদাতা এমন এক বুদ্ধিমান প্রাণীর উৎপত্তি ঘটতে পারে? তাহলে কি কোন স্বর্গীয় স্পর্শ আমাদের মস্তিষ্ককে বিশেষভাবে তৈরি করেছিল? মানুষের উদ্ভব কি কোন স্বর্গীয় স্পর্শের ফসল? না, আমি তা মনে করি না, কারণ ডারউইন প্রদত্ত প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া দিয়েই মানুষের বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, এবং বিবর্তনের ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক কিংবা অলৌকিক ব্যাখ্যার চেয়ে অনেক বেশি যুক্তিগ্রাহ্য।’

* অধ্যাপক স্টিভেন পিঙ্কার, এমআইটি’র মস্তিষ্ক এবং বৌদ্ধিক বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক, ভাষা, ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ এবং তার সাথে বিবর্তনবাদের সম্পর্ক, মানুষের মন, সচেতন জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বিখ্যাত। *How the mind works* সহ বেশ কিছু আলোচিত গ্রন্থের প্রণেতা।

মানুষের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে দু'টির কথা তো চোখ বন্ধ করেই বলা যায় : মানুষ একমাত্র প্রাণী যে দুই পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে শিখেছে, আর ওদিকে আবার খুব অসাধারণ রকমের বড় মস্তিস্কেরও বিবর্তন ঘটেছে যা অন্য কোন প্রাণীতে ঘটতে দেখা যায় নি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অত্যন্ত সুপরিচিত জীববিজ্ঞানী, এডওয়ার্ড উইলসনের গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০ লক্ষ বছর আগে থেকে শুরু করে আড়াই লাখ বছর আগে পর্যন্তও আমাদের মস্তিস্কের আকার প্রতি এক লাখ বছরে প্রায় এক চামচের সমান করে বেড়েছিলো^(১)। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ধীরগতিতে হলেও এখনও আমাদের মস্তিস্কের বিবর্তন ঘটে চলেছে। আমাদের মস্তিস্কের যে অংশটি আমাদের বুদ্ধিমত্তার সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সেই সেরিব্রেল করটেক্স কে যদি টেনে ফ্ল্যাট করে বিছিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে যে তা চার পৃষ্ঠা জুড়ে জায়গা করে নিচ্ছে। আমাদের সবচেয়ে কাছের পূর্বসূরি শিম্পাঞ্জীদের সেরিব্রেল করটেক্স নেবে মাত্র এক পাতার সমান জায়গা, বানরেরটা নেবে একটি পোস্টকার্ডের সমান আর হুঁড়ুরের ক্ষেত্রে তা নেবে মাত্র একটা স্ট্যাম্পের সমান জায়গা^(২)।

পার্থক্যটা চোখে পড়ার মতই, তাই হয়তো সাফল্যের পাল্লাটাও বেশ ভারী। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, উহু!, মস্তিস্কের আকারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেটাই বোধ হয় একমাত্র কারণ নয়! তাহলে তো আমাদের মত বড় মস্তিস্কের অধিকারী নিয়াভারখাল প্রজাতির মানুষরাও একই রকম সাফল্য অর্জন করতে পারতো - তাদের মত প্রজাতির তো তাহলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা নয়। একদিকে মস্তিস্কের বিকাশ, অন্যদিকে ঘটেছে ভাষার উৎপত্তি ও ব্যবহার, আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে ঘটেছে সাংস্কৃতিক বিবর্তন এবং বিকাশ ঘটেছে জটিল এক সামাজিক ব্যবস্থার। মানুষের বিবর্তনে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যা হয়তো অন্য কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে সেভাবে প্রয়োজ্য নয়। এখানেই তো শেষ নয়, গত কয়েক লক্ষ বছরে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকা পরিবেশগত পরিবর্তনের ব্যাপারটাকেও তো এই সমীকরণ থেকে বাদ দিয়ে দিলে চলবে না। এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে টিকে থাকার জন্য মানুষ যত নতুন ভাবে অভিযোজিত হয়েছে বিবর্তনের নিয়মে ততই বিকশিত হয়েছে তার নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য।

আমরা জানি যে, এই মহাবিশ্ব প্রায় ১৪শ' কোটি বছর আগে সৃষ্টি হলেও আমাদের এই বুড়ো পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে প্রায় সাড়ে ৪শ' কোটি বছর আগে। এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, প্রাণের জন্ম হতে লেগে গিয়েছিলো আরও প্রায় একশো কোটি বছর। আর মানুষের উৎপত্তি? সে তো সে দিনকার কথা! আদিম এককোষী প্রাণ, ব্যাকটেরিয়া, বহুকোষী প্রাণী, অ্যালজি, অমেরুদণ্ডী প্রাণী, বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর উৎপত্তি, বিকাশ বা বিলুপ্তির ধাপ বেয়ে, বিবর্তনের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে মানুষের আদি পূর্বপুরুষদের উদ্ভব ঘটলো মাত্র ৫০-৬০ লাখ বছর আগে। সে সময়ে মানুষ এবং অন্যান্য বনমানুষের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কিছু প্রজাতির পায়ে উপর ভর করে দাঁড়াত শিখলেও তার থেকে আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষদের উদ্ভব ঘটতে লেগে গেছে আরও প্রায় ৩০ লক্ষ বছর। আর আমাদের নিজেদের প্রজাতি অর্থাৎ *Homo Sapiens* দেয় গল্পের শুরু তো সেদিন, মাত্র দেড় দুই লাখ বছর আগে। ভূতাত্ত্বিক নিয়মে হিসাব করলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের ব্যাপারটা একেবারেই আনকোরা। কতটা আনকোরা, তা 'মহাজাগতিক ক্যালেন্ডারের' একটা সহজ এবং বোধগম্য উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। এই ধরনের উদাহরণ প্রথম বোধ হয়

ব্যবহার করেছিলেন বিজ্ঞানী কার্ল স্যাগান। উদাহরণের ধরণটি আমার খুব প্রিয়। আমি এই আমার ‘বিবর্তনের পথ ধরে’ (অবসর প্রকাশনা, ২০০৭) বইয়ে বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছি। ধরুন, সাড়ে চারশো কোটি বছর ইতিহাসটাকে আমরা ১২ মাসের ক্যালেন্ডারে ফেলে প্রাণের বিকাশের সময়সীমাগুলো সম্পর্কে একটা আপেক্ষিক বা তুলনামূলক ধারণা পেতে চাই। সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়াবে অনেকটা এরকমঃ পৃথিবীর জন্ম প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিলো বছরের প্রথম দিন বা পয়লা জানুয়ারীতে, আর ফেব্রুয়ারী বা মার্চে প্রথম উৎপত্তি ঘটলো ব্যকটেরিয়া বা নীলাভ শৈবাল জাতীয় প্রথম আদি প্রাণের। এই আদি জীবদের প্রতিপত্তি চলেছে বহুকাল ধরে। বছরের অর্ধেকেরও বেশী পেরিয়ে অক্টোবর মাস এসে গেছে বহুকোষী জীবের বিকাশ হতে হতে। জটিল ধরণের কোন প্রাণীর সন্ধান পেতে হলে আপনাকে কিন্তু সেই নভেম্বর মাসে এসে পৌঁছাতে হবে, যদিও তাদের রাজত্ব তখনও শুধুমাত্র পানিতেই সীমিত। নভেম্বরের শেষের দিকে প্রথমবারের মত পানিতে চোয়ালওয়ালা মাছ আর মাটিতে উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, আর ওদিকে পানি থেকে ডাঙ্গায় বিবর্তিত হওয়া প্রাণীগুলো পৃথিবীর মাটিতে রীতিমত জাঁকিয়ে বসেছে ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে। জুরাসিক পার্ক সিনেমায় দেখা সেই বড় বড় ডায়নোসরগুলোর আধিপত্য শুরু হলো এ মাসের মাঝামাঝি, কিন্তু ২৬ তারিখ আসতে না আসতেই তারা আবার চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেলো পৃথিবীর বুক থেকে। খেয়াল করে দেখুন যে বছর শেষ হতে আর মাত্র ৫ দিন বাকি, কিন্তু এখনও মানুষ নামক আমাদের এই বিশেষ প্রজাতিটির কোন নাম গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে না পৃথিবীর বুক। ডিসেম্বরের ২৬ তারিখের দিকে অন্যান্য প্রাণীর বিবর্তন শুরু হয়ে গেলেও বানর জাতীয় প্রাণীর দেখা মিলছে ২৯ তারিখে আর নর বানরের উৎপত্তি ঘটতে দেখা যাচ্ছে ৩০ তারিখে। বছরের শেষ দিনে এসে উৎপত্তি ঘটলো শিম্পাঞ্জির আর আমাদের এই মানুষ প্রজাতির কথা যদি বলেন তাহলে তাদের দেখা মিললো বছর শেষের ঘন্টা বাজার মাত্র ২০ মিনিট আগে। আমরা এই আধুনিক মানুষেরা ইউরোপ অস্ট্রেলিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছি এই তো মাত্র ৬ মিনিট আগে আর কৃষি কাজ করতে শিখেছি ঘড়িতে রাত বারোটা বাজার ১ মিনিট আগে ^(১৫)!

শুধু তো তাইই নয়, বিবর্তনের ধারায় যেমন অগুনতি জীবের উৎপত্তি ঘটেছে ঠিক তেমনি তাদের একটা বড় অংশ বিলুপ্তও হয়ে গেছে। একইভাবে আমরা ফসিল রেকর্ড থেকে দেখতে পাই যে, মানুষেরও বিভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটেছে, আবার আমাদের প্রজাতি ছাড়া বাকিরা বিলীন হয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায়। বিবর্তনের ইতিহাসে অনিয়মিততার তো কোনো শেষ নেই, ডায়নোসরের মত অতিকায় প্রাণী বহুকাল ধরে পৃথিবীর বুক রাজত্ব করেও শেষপর্যন্ত হারিয়ে গেছে। সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ভয়ঙ্কর কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মহাপরাদ্রমশালী ডায়নোসরগুলো বিলুপ্ত হয়ে না গেলে সেই সময়ের অত্যন্ত নগন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলো হয়তো এত বিকশিত হতে পারতো না। অর্থাৎ, অন্যান্য প্রাণীর মতই আমাদের উদ্ভবও তো কোনো পূর্ব নির্ধারিত ব্যাপার নয়। প্রখ্যাত বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী এবং ফসিলবিদ স্টিফেন জে. গুলড তাই বলেছিলেন ^(১৬),

‘মানুষ আগে থেকে নির্ধারিত বিবর্তনের কোন ধারার শেষ ফসল নয় বরং মানুষ হচ্ছে আকস্মিকভাবে উদ্ভূত মহাজাগতিক এক অনুচিন্তার ফলাফল। বিশাল শাখা প্রশাখাসহ যে প্রাণবৃক্ষের বিবর্তন আমাদের এ পৃথিবীতে ঘটেছে মানুষ হচ্ছে তার একটা ছোট্টো শাখামাত্র। এরকম নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, এই গাছের বীজটাকে যদি আবার নতুন করে বপন করা হয় তাহলে এই শাখাটা আবার একই রকমভাবে একই জায়গায় জন্ম নেবে না।’

আমরা জানি যে, ষোড়শ শতাব্দীতে এসে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের ধারণাটা হাজার বছর ধরে টিকে থাকা মধ্যযুগীয় ধর্মীয় এবং সামাজিক স্থবিরতার ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপরও তো প্রায় কয়েকশ বছর লেগে গিয়েছিল সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে। আমরা জানি কিভাবে বহু বাঁধাবিঘ্ন পেরিয়ে জীববিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেরিয়ে এসেছিলো সেই ‘প্রজাতির পৃথক পৃথক সৃষ্টি’ এবং স্থির প্রজাতির মতবাদের ভ্রান্তি থেকে! প্রথমবারের মতো আমরা জানতে পেরেছিলাম আমাদের উৎপত্তি এবং বিকাশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা। তারপর প্রায় দেড়শো বছর কেটে গেছে, বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক শাখাগুলো প্রতিদিনই আরও জোরালোভাবে এই বিবর্তন তত্ত্বের সঠিকতা প্রমাণ করে চলেছে, কিন্তু প্রাচীন চিন্তার অচলায়তন ভেঙে আমাদের সমাজে তা কিন্তু এখনও জায়গা করে নিতে পারেনি। পৃথিবীতে যে গুটিকয়েক তত্ত্ব সমস্ত পুরোনো ঘুণে ধরা রক্ষণশীল ভ্রান্ত চিন্তা ভাবনা ও প্রথাকে সম্মুখে আঘাত করেছে তার মধ্যে বিবর্তনবাদ অন্যতম। তাই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধেরও মাত্রাটা যে একটু বাড়াবাড়ি রকমের বেশি হবে তা তো জানা কথাই। মানব সভ্যতার সমগ্র ইতিহাস জুড়েই আমরা এর পুনরাবৃত্তি দেখে এসেছি। অন্যান্য জীবের বিবর্তন নিয়ে কথা বললে যাও বা ঠিক আছে, কিন্তু মানুষের বিবর্তনের প্রসঙ্গ আসলেই আমাদের মাথায় যেনো আকাশ ভেঙে পড়ে। সেই ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইন এবং অ্যালফ্রেড ওয়ালেস যখন প্রথম বিবর্তনের তত্ত্বটি প্রস্তাব করলেন তখন চার্চের বিশপের স্ত্রী মুখ থেকে যে আতঙ্কবাণী বের হয়ে এসেছিলো, তা যেনো আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। তিনি আতর্নাদ করে বলেছিলেন^(৪),

‘বনমানুষ থেকে আমাদের বিবর্তন ঘটেছে! আশা করি যেনো এটা সত্যি না হয়, আর যদি তা একান্তই সত্য হয়ে থাকে তবে চলো আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি সাধারণ মানুষ যেনো এটা কখনই জানতে না পারে!’

সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সত্যকে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা তো আর নতুন কিছুই নয়। এখনও বিশ্বব্যাপী সেই চেষ্টার যেন কোনো কমতি নেই!

ডারউইন প্রথমে তার ‘প্রজাতির উৎপত্তি’ বইটিতে মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে তেমন কিছুই বলেন নি (শুধু বলেছিলেন, ‘Light will be thrown on the origin of man and his history’); সেই সময়ের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার এই নিশ্চুপতার কারণটা বোঝা তেমন কঠিনও নয়। ডারউইন যে সময়টিতে তার যুগান্তকারী বইটি প্রকাশ করেছিলেন, সে সময় ১৮৫৭ সালের দিকে জার্মানির ডুসেল নদীর উপত্যকায় নিয়েভারখাল নামক জায়গায় বেশ কিছু আদিম মানুষের করোটি আবিষ্কৃত হয়।

তখন জার্মানির প্রখ্যাত অধ্যাপক স্কাফ হাউসেন ফসিলগুলো পর্যবেক্ষণ করে প্রস্তাব করেন যে, এগুলো আসলে মানুষের কোনো বিলুপ্ত আদিম প্রজাতির হাড়গোড়। এদের নাম দেওয়া হয় নিয়েভারখাল মানুষ^(৫)। তখনকার শিক্ষিত সমাজ কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করেননি। ওদিকে ডারউইনের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং বিজ্ঞানী টি এইচ হাক্সলি সে সময়ই মানুষের বিবর্তনের বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং এপ বা বন মানুষের সাথে মানুষের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যগুলো তুলে ধরে ১৮৬৩ সালে ‘Evidence as to Man’s Place in Nature’ নামক বইটি প্রকাশ করেন। এর পর ডারউইন যখন ‘The Descent of man and selection with respect to

'Sex' বইটি বের করেন ততদিনে মানুষের বিবর্তনের বিষয়টি বুদ্ধিজীবীমহলে মোটামুটিভাবে সুপরিচিত হয়ে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জার্মানি বিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেল তার বিখ্যাত 'সৃষ্টির ইতিহাস' বইয়ে লিখেছিলেন যে, বনমানুষ থেকে মানুষের বিবর্তন যদি সত্যিই ঘটে থাকে তবে মানুষও নয় আবার ঠিক বনমানুষও নয় এমন ধরণের মধ্যস্থিত ফসিল পাওয়া যাবে। তিনিই প্রথম বিবর্তনের মধ্যবর্তী অবস্থার এরকম ফসিলগুলোকে হারানো যোগসূত্র বা missing link বলে আখ্যায়িত করেন^(৬)। তার কথাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে - গত একশো বছরে এমন অসংখ্য ফসিলের সন্ধান পাওয়া গেছে যা থেকে মানুষ এবং বনমানুষের মধ্যবর্তী অবস্থার বিবর্তনের ধাপগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুধু তো তাইই নয়, এ থেকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন সময়ে আমাদের প্রজাতির মানুষ ছাড়াও আরও অন্যান্য প্রজাতির মানুষও বিচরণ করেছিলো, এমনকি অনেক সময় একাধিক প্রজাতির মানুষ একই সময়ে তাদের সম্মিলিত পদচারণায় মুখরিত করে তুলেছিলো আমাদের এই ধরনী। এই মুহূর্তে আমরা ছাড়া আর কোনো মানব প্রজাতির অস্তিত্ব না থাকলেও অতীতে বহুবিধ প্রজাতির কুকুর বা বিড়ালের মত বিভিন্ন প্রজাতির মানুষও যে তা ছিলো তা নিয়ে কিন্তু দ্বিমত প্রকাশের কোনো অবকাশই আর নেই।

গত একশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা মানুষ এবং এপের মধ্যবর্তী স্তরের যে সমস্ত ফসিল খুঁজে পেয়েছেন তা থেকে মানব বিবর্তনের একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া কিন্তু আর কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। এখন সমস্যাটি আর 'যথেষ্ট পরিমাণে ফসিল পাওয়া যাচ্ছে না' তা নয় বরং ঠিক তার উলটো। এত রকমের মানুষের পূর্বপুরুষের প্রজাতির এবং তাদের মধ্যবর্তী স্তরের ফসিল পাওয়া যাচ্ছে যে তাদেরকে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঠিক ঠাক মত শ্রেণীবিন্যাস করাটাই বিজ্ঞানীদের জন্য এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেলের মনোবাঞ্ছা যে এভাবে পূরণ হবে তা হয়তো তিনি নিজেও আশা করেননি। তার ওপরে আবার গত কয়েক দশকে ডেটিং পদ্ধতির যে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে তার ফলে ঠিকভাবে ফসিলের বয়স এবং প্রকৃতি নির্ধারণ করার ক্ষমতাও বেড়ে গেছে বহুগুণ।

এছাড়া মানুষ এবং এপের দৈহিক গঠনের তুলনামূলক বিচার থেকেও বহু তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের সাথে এপ বা বনমানুষের পার্থক্যগুলো যত বেশি না পরিমাণগত, তার চেয়ে অনেক বেশি গুণগত। মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রকমের ভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের আকার বিশেষত মস্তিষ্কের আকার মানুষের অনেক বড়, বন মানুষের সাথে তাদের হাত এবং পায়ের আকারের অনুপাতেও পার্থক্য রয়েছে, গায়ের লোম পড়ে গেছে অনেকাংশেই, চামড়ার রঞ্জকবস্তু এবং বুড়ো আঙুল নাড়াবার ক্ষমতাও মানুষের অনেক বেশি। আগে মানুষের সাথে বনমানুষের পার্থক্যকে যত বড় বলে মনে করা হত আধুনিক গবেষণার ফলে তা দ্রুতঃ যেন কমে আসছে। অনেকেই এখনও ব্রিটিশ বিজ্ঞানী রিচার্ড ওয়েন (১৮০৪-১৮৯২) এর বলা কিছু ভুল তথ্যকে সত্য বলে মনে করে বসে আছেন। ওয়েন মনে করেছিলেন যে, তিনি মানুষ এবং বনমানুষের মধ্যে বিশাল এক পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে মানুষ এবং বনমানুষ একই পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে আসেনি। তিনি বলেন মানুষের মস্তিষ্কে হিপোক্যাম্পাস নামের একটি বাড়তি উপাঙ্গ রয়েছে যা কি না বনমানুষের মধ্যে নেই। কিন্তু ডারউইনের বস্তু টি এইচ হার্সলি তখনই তা ভুল প্রমাণ করেন, প্রকৃতপক্ষে মানুষ এবং এপ দুই গ্রুপের মস্তিষ্কের মধ্যে এই উপাঙ্গটির অস্তিত্ব রয়েছে।

এতো গেলো একটা দিক, অন্যদিকে জেনেটিক্স এবং জিনোমিক্সের আধুনিক গবেষণা এবং পর্যালোচনাকে বাদ দিলে তো বিবর্তনের গল্প বলাই এখন আর সম্ভব নয়। গত দুই তিন দশকে বিজ্ঞানের এই শাখাটি বিবর্তনবাদ এবং মানুষের বিবর্তনের পক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী সব তথ্য এবং সাক্ষ্য হাজির করেছে যার সাথে অঙ্গস্থানবিদ্যা এবং ফসিলবিদ্যা থেকে আলাদা আলাদাভাবে পাওয়া তথ্যগুলো প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। আর দু'এক জায়গায় যেখানে অমিল বা সংশয় ধরা পড়ছে সেখানে বিজ্ঞানীরা সুযোগ পাচ্ছেন আরও নতুন নতুন গবেষণার মাধ্যমে ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার। বিজ্ঞানের তিনটি শাখা থেকে স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া এই সম্মিলিত তথ্যগুলো বিবর্তনবিদ্যাকে অত্যন্ত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। গত কয়েক দশকে আণবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স, জিনোমিক্সের বিভিন্ন আবিষ্কারগুলো প্রাণের বিবর্তন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে এক নতুন পর্যায়ে উত্তোরিত করেছে। চলুন খুব সংক্ষেপে দেখা যাক আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় আমাদের নিজেদের বিবর্তনের গল্পটা এখন কীরকম শোনাচ্ছে।

বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিঙ্গ তার *Unweaving the Rainbow* বইতে বলেছিলেন যে, ডিএনএ হচ্ছে ‘মূতের জেনেটিক বই’-আমাদের পূর্বপুরুষের ইতিহাসের রোজনামাচা যেন তারা। বিবর্তনবিদ্যা বলে যে, জীবের শরীরের সবকিছুই তার পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আর এদিকে ডিএনএ’র মধ্যে বিস্তারিতভাবে লেখা রয়েছে সেই কাহিনীর পূর্ণ ধারাবাহিক বিবরণী - কখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে, কোন পরিবেশে টিকে থাকার জন্য যুদ্ধ করেছে, প্রজননের ইতিহাস থেকে শুরু করে কোথায় কখন কোন মিউটেশন তাদের বিবর্তনের গतिकে নিয়ে গেছে নতুন দিগন্তে -সবকিছু লেখা আছে আমাদের ডিএনএ-র ভিতরে। প্রজননের মাধ্যমে পরের প্রজন্ম তৈরির ধারাবাহিকতা যদি ছিল না হয় তাহলে ডিএনএ-এর ভিতরে লেখা তথ্যগুলো এক অণু থেকে আরেক অণুতে, এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। প্রতিটি জীব তার দেহকোষের ভিতরে হাজার লক্ষ এমনকি কোটি বছর ধরে এই ঐতিহাসিক তথ্য বয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা মোটে গত কয়েক দশক ধরে আণবিক জীববিদ্যার প্রভূত অগ্রগতির ফলে সঠিকভাবে ডিএনএর ভিতরে লেখা এই তথ্যগুলো পড়তে এবং বুঝতে শুরু করেছি। ড. রিচার্ড ডকিঙ্গ মনে করেন যে^(a) -

পৃথিবীতে যদি একটাও ফসিলের অস্তিত্ব না থাকতো, বা কেউ যদি তাদেরকে কোন ম্যাজিক করে উড়িয়ে দিত, তাহলেও পৃথিবী জোড়া জীবের বিবর্তনের প্যাটার্ন এবং তাদের জেনেটিক তথ্য থেকেই সম্পূর্ণ বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করা সম্ভব হতো।

কথাটা শুনতে অতিরঞ্জণ বা ঔদ্ধত্য বলে মনে হলেও, আজকে একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দাঁড়িয়ে, আণবিক জীববিদ্যার সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলোকে একটু মনযোগ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেই বোঝা যায় যে, কথাটা আদৌ মিথ্যা নয়।

মানুষের জিনোমের সিকোয়েন্সিং বা অনুক্রমের ঐতিহাসিক প্রথম খসড়াটি প্রকাশিত হয় ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এই প্রজেক্টে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৩ সালে এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়^(b)। এর কিছুদিন পরেই, ২০০৫ সালে, আমাদের

বিবর্তনের ইতিহাসে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শিম্পাঞ্জির জিনোমও পড়ে শেষ করা হয়^(৮) (এদিকে আবার গত কয়েক বছরে ইঁদুর, মৌমাছি, ইস্টসহ বেশ কয়েকটি জীবের জিনোমের অনুক্রমও বের করা হয়েছে, ইন্টারনেটের ওয়েব সাইটগুলোতে এখন মানুষ এবং শিম্পাঞ্জিসহ বিভিন্ন জীবের জিনোমের অনুক্রমের বিস্তারিত তথ্য রাখা আছে^(৯))। পৃথিবী জোড়া ৬৭ জন বিজ্ঞানী এই শিম্পাঞ্জি সিকোয়েন্সিং এ্যান্ড এ্যানালিসিস কনসোর্টিয়ামে অংশগ্রহণ করেন, নেচার জার্নালের ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর ইস্যুতে মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির জিনোমের তুলনামূলক বিশ্লেষণের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয়^(১০)। ন্যাশনাল হিউম্যান জিনোম রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (NHGRI) এর ডিরেকটর ফ্রান্সিস কলিঙ্গ এর মতে, এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস, শারীরিক গঠন, বিভিন্ন ধরনের অসুখ বিসুখের উৎপত্তি বুঝতে হলে বিবর্তনের ধারায় উদ্ভূত এবং অত্যন্ত কাছাকাছি সম্পর্কিত বিভিন্ন জীবের জিনোমের সাথে আমাদের জিনোমের তুলনামূলক ব্যাখ্যা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের জিনোমের পরীক্ষার সাথে ফসিল রেকর্ড এবং শারীরবিদ্যার তুলনামূলক ব্যাখ্যা থেকে বিজ্ঞানীরা আগে শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে যা ভেবেছিলেন তা প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। এদের বর্তমান জিনোমের মধ্যে সাদৃশ্য প্রায় ৯৯% এবং তাদের প্রোটিনের গঠনও খুবই কাছাকাছি। ডিএনএ-র সন্নিবেশন এবং বিলুপ্তি হিসাব করলে এই সাদৃশ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৬%এ। প্রোটিনের স্তরে বিচার করলে দেখা যায় যে তাদের ২৯% জিন একই প্রোটিনের কোডিং এ নিয়োজিত। অর্থাৎ দুটো মানুষের ডিএনএ তুলনা করলে যে পার্থক্য দেখা যাবে, একটা মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির মধ্যে সে পার্থক্যটা মাত্র ১০ গুণ বেশী, কিংবা ধরুন ইঁদুরের সাথে মানুষের যে পার্থক্য তার তুলনায় শিম্পাঞ্জির সাথে পার্থক্য ৬০গুণ কম^(১১)! বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন যে, মানুষ এবং শিম্পাঞ্জিতে কিছু কিছু জিন অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর তুলনায় ত্রুটিগতভাবে দ্রুতগতিতে বদলে যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে শব্দ শোনা এবং বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় জিন, স্নায়ুতন্ত্রের সংকেত আদান-প্রদানের জিন, শুক্রাণু তেরির জিনসহ আরও কয়েকটি জিন। এদিকে আবার দেখা যাচ্ছে যে, বিবর্তনের ধারায় মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির ডিএনএ'তে ইঁদুর বা খরগোশের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ক্ষতিকর মিউটেশন ঘটেছে। তার ফলে একদিকে যেমন তাদের অসুখের পরিমাণ বেড়েছে কিন্তু অন্যদিকে আবার তা তাদেরকে পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হতে বাড়তি সুবিধা করে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা মানুষের জিনোমের এই ধরনের মিউটেশনগুলো আরও খতিয়ে দেখছেন। শিম্পাঞ্জি, অন্যান্য প্রাইমেট বা অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর সাথে আমাদের মিলগুলো বোঝা যেমন দরকার ঠিক তেমনিভাবেই গুরুত্বপূর্ণ এদের সাথে আমাদের পার্থক্যগুলো সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারা। তাহলেই হয়তো আমরা বলতে পারবো কোন কোন পরিবর্তনগুলোর ফলে আমরা মানুষে বিবর্তিত হয়েছি, কিংবা ঠিক কোন কোন বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে আমরা তাদের থেকে বুদ্ধিমত্তায় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে এত আলাদা হয়ে গেছি। ইতোমধ্যেই আমরা এই ধরনের বিশ্লেষণ থেকে এমন কিছু কিছু তথ্য জানতে পেরেছি যা আমাদের স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারে। যেমন ধরুন, দেখা যাচ্ছে যে, শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের সাধারণ পূর্বসুরি থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর মানুষ Caspase-12 নামক জিনের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে যার ফলেই সে এখন আলজাইমারস বা স্মৃতিভ্রংশ রোগে আক্রান্ত হয়। এখন আমরা যদি শিম্পাঞ্জির মধ্যে এই জিনের কাজগুলোকে ঠিকমতো বুঝতে পেরে আমাদের শরীরে মধ্যে তার প্রয়োগ ঘটাতে পারি তাহলে হয়তো এই মারাত্মক রোগটি থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিভিন্ন রোগের সাথে আমাদের

জেনেটিক গঠনের বিবর্তনের ইতিহাস যে কী ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তা এখন ধীরে ধীরে আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

গত শতাব্দীর প্রথম দিকে কিন্তু মানুষের তেমন কোন মধ্যবর্তী ফসিলের সন্ধান পাওয়া যায়নি, অনেকেই তখন মনে করতেন যে, মানুষ হয়তো অন্যান্য বনমানুষের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো প্রায় ৫ কোটি বছর আগে। তারপর ধীরে ধীরে যখন আরও অনেক ফসিল পাওয়া যেতে শুরু করলো, এদিকে আবার বিজ্ঞানীরা মানুষের সাথে ওরাং ওটাং, গরিলা, শিম্পাঞ্জির মিলগুলো আরও ভালো করে বুঝতে শুরু করলেন তখন মনে করা হল যে, হয়তো দেড় কোটি বছর আগে মানুষের বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিলো। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডিএনএর আবিষ্কারের পর আমাদের সামনে আণবিক জীববিদ্যার গবেষণার দুয়ার খুলে যায়। সত্তরের দশকে মানুষ এবং অন্যান্য বনমানুষের প্রোটিনের এমআইনো এসিডের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, বিবর্তনের যাত্রায় মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির আলাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা ৫০ লক্ষ বছরের বেশি পুরোনো হতে পারে না। এদিকে আবার গত তিরিশ, চল্লিশ বছরে ফসিলবিদেরা আফ্রিকা থেকে মানুষের ‘আধা’ এবং ‘সম্পূর্ণ’ আদিপুরুষদের যে সব ফসিল খুঁজে পেয়েছেন তা থেকেও কিন্তু আমরা এখন একই ধরণের তথ্য পেতে শুরু করেছি। আর এদিকে আজকের জিনোমিক্সের অত্যাধুনিক গবেষণা থেকেও আমরা এ বিষয়ে অত্যন্ত জোরালো সাক্ষ্য পেতে শুরু করেছি। ২০০৬ সালের মে মাসে এমআইটি এবং হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা নেচার জার্নালে যে গবেষণাটি প্রকাশ করেন তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ এবং শিম্পাঞ্জি তাদের সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো ৫৪ লক্ষ থেকে ৬৩ লক্ষ বছর আগে এবং তাদের আলাদা হয়ে যাওয়ার ইতিহাসটি বেশ জটিল^(১২)। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়ে যাওয়ার আগে এই দুই প্রজাতি বা উপপ্রজাতির মধ্যে বেশ লম্বা সময় ধরে প্রজনন ঘটেছিল যা আমাদের ক্রোমোজোম-এর মধ্যে গভীর ছাপ ফেলে গেছে। কে জানে, এ জন্যই হয়তো আমরা এত লম্বা সময় ধরে আফ্রিকাজুড়ে ‘না-বনমানুষ-না-মানুষ’ জাতীয় মধ্যবর্তী মানুষের বা মিসিং লিঙ্কের সন্ধান পাচ্ছি!

একটা মজার গল্প দিয়ে লেখাটা শেষ করা যাক। শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাং ওটাং সবার মধ্যে ক্রোমোসোমের সংখ্যা ৪৮, হঠাৎ করেই দেখা যাচ্ছে যে, একই হোমিনয়ডিয়া দলের সদস্য হওয়া স্বত্বেও, মানুষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা হয়ে গেছে ৪৬। বিবর্তনের তত্ত্বানুযায়ী এরা যদি পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে থাকে এবং অন্যদের সবার মধ্যে ৪৮ টি ক্রোমোসোমের অস্তিত্ব থাকে, তাহলে অবশ্য আমাদেরকে এখন প্রশ্ন করতে হবে, মানুষের জিনোম থেকে দু’টো ক্রোমোসোম কোথায় হারিয়ে গেল? বিবর্তন তত্ত্ব যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে তো একদিন হঠাৎ করে ক্রোমোসোম দু’টো হাওয়া হয়ে যেতে পারে না, তাদের কোনো না কোনো রকমের চিহ্ন থাকতেই হবে মানুষের জিনোমের মধ্যে। আর যদি এ ধরণের কোন নমুনা একেবারেই না পাওয়া যায় তাহলে তো বিবর্তনবাদের মূল বিষয়টি নিয়েই সন্দেহের অবকাশ থেকে যাচ্ছে। জীববিদরা প্রকল্প দিলেন যে, যেহেতু সব বনমানুষের মধ্যে এখনও ৪৮টা ক্রোমোসোম আছে কিন্তু এদের দলের মধ্যে শুধুমাত্র মানুষেরই দু’টো ক্রোমোসোম কম আছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, শেষ সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর বিবর্তনের পথে চলতে চলতে কোন এক সময়ে মানুষের প্রজাতির মধ্যে আদি দু’টো ক্রোমোসোম সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল, যা অন্যান্য বনমানুষের ক্ষেত্রে ঘটেনি। শেষ পর্যন্ত, এই তো কিছুদিন আগে, ২০০২ সালে বিজ্ঞানীরা দেখালেন যে, আসলে শিম্পাঞ্জিদের যে ১২ এবং ১৩ নম্বর ক্রোমোসোম (এখন তাদেরকে

2A এবং 2B বলে নামকরণ করা হয়েছে) রয়েছে সে দু'টো মানুষের মধ্যে মুখোমুখিভাবে সংযুক্ত হয়ে ক্রোমোজোম ২ তৈরি করেছে^(১০)। এই দু'টো ক্রোমোজোমের সংযুক্তির বিন্দুটির গঠন নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা থেকেও মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের আরও অনেক তথ্য বের হয়ে এসেছে, কিন্তু তা নিয়ে এখানে আর আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। আসলে এ ধরনের ক্ষেত্রগুলোতেই আমরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে বিবর্তনবাদের শক্তি এবং সঠিকতা বুঝতে পারি। কোন সঠিক তত্ত্ব থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বা পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয় যা অবৈজ্ঞানিক কোনো কিছুর উপর ভিত্তি করে দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন ধরুন, মানুষের শরীরে কোনভাবেই এই হারিয়ে যাওয়া ক্রোমোজোমটির অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া যেত তাহলে বিবর্তন তত্ত্বের সঠিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হতেন বিজ্ঞানীমহল।

এছাড়াও মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির জিনোম বিশ্লেষণ থেকে বিজ্ঞানীরা মানুষের মস্তিষ্কের অত্যন্ত দ্রুত বিকাশের জন্য দায়ী জিনগুলো, তাদের বিকাশের সময়সীমা, বিভিন্ন ধরনের প্রোটিনের গঠন, বনমানুষদের মধ্যে ঘ্রাণশক্তির লোপ এবং সেই সাথে সাথে শক্তিশালী দৃষ্টিশক্তির বিকাশের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য পেতে শুরু করেছেন। এমআইটি এবং হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ব্রড ইনস্টিটিউটের সদস্য বিজ্ঞানী টি মিকেলসনের মতে, আগামী কয়েক বছরে আরও অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং প্রাইমেটের জিনোমের অনুক্রম বের করে ফেলা যাবে, সেখান থেকে খুব সহজেই মানুষের বিবর্তনের জন্য দায়ী বিশেষ ডিএনএর অনুক্রমগুলো বেড়িয়ে পড়বে। মানুষের বিবর্তনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো, যেমন ধরুন, দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে পারা, মস্তিষ্কের বিবর্ধন বা জটিল ভাষাগত দক্ষতার মতো বিবর্তনের বিশেষ ধাপগুলোতে কী ধরনের জেনেটিক পরিবর্তন কাজ করেছিল সেগুলো আবিষ্কার করতে পারলে হয়তো আমরা মানুষের বিবর্তনের একটা সম্পূর্ণ রূপরেখা তৈরি করতে পারবো^(১৪)। আবার অন্য দিকে এই জেনেটিক পরিবর্তনগুলো তাদেরকে টিকে থাকার জন্য কি বিশেষ ধরনের সুবিধা করে দিয়েছিল -এগুলো কি তাদের পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বাড়তি সুবিধা করে দিয়েছিল নাকি দ্রুত চলাচলে বা পারস্পরিক সংযোগ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল, নাকি সামাজিকভাবে দলবদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকার ক্ষমতা যুগিয়েছিল-এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে রয়েছে আমাদের উৎপত্তি এবং বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাসের রহস্য। লেখাটি শেষ করা যায় এই বলে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রজাতির জীবসহ দ্বিপদী এই মানব প্রজাতিরও সেই আদি এক কোষী প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়ে এখানে এসে পৌঁছানোর জন্য কোন পরিকল্পনা বা ডিজাইন বা অতিপ্রাকৃত স্রষ্টার প্রয়োজন হয়নি, কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় উদ্ভব ঘটেছে তাদের। মানুষ যতই সে নিজেকে ঘিরে শ্রেষ্ঠত্বের মায়াজাল তৈরি করুক না কেনো, কিংবা যতই নিজের উদ্ভবকে কোন এক স্বর্গীয় স্পর্শের ফসল ভেবে চোখ বুজে আত্মপ্রসাদ লাভ করুক না কেন, সে আর সব প্রাণীর মত এই প্রকৃতিরই একটি অংশমাত্র।

তথ্যসূত্র :

1. DiChristine M, 2006, Becoming Human, Scientific American Science Magazine:Special Edition, p.1.
2. Calvin W. 2006, The Emergence of Intelligence, Scientific American:Special Edition, pp 85.
3. Gould, S, J: Understanding Evolution, PBS Website :
(http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/08/1/1_081_06.html)

4. Skybreak, A. 2006, The Science of Evolution and The Myth Of Creationism, Insight Press, Illinois, USA.
5. আখতারুজ্জামান, ম, ১৯৯৮, বিবর্তনবাদ, বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা ৩১৯।
6. আখতারুজ্জামান, প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা ৩২২।
7. Dawkins R, 2004, The Ancestor's Tale, 2004. Houghton Mifflin Company, Boston, New York.
8. The Human Genome Project, <http://genome.wellcome.ac.uk/node30075.html>
9. New Genome Comparison Finds Chimps, Humans Very Similar At DNA Level, 2005, Science Daily Magazine. <http://www.sciencedaily.com/releases/2005/09/050901074102.htm>
10. Ibid
11. Ibid
12. Human and Chimp Genomes Reveal New Twist on Origin of Species, 2006, Science Daily Magazine. <http://www.sciencedaily.com/releases/2006/05/060518075823.htm>
13. Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium ,2005. "Initial sequence of the chimpanzee genome and comparison with the human genome". Nature 437: 69-87
http://www.genome.gov/Pages/Research/DIR/Chimp_Analysis.pdf, Kenneth R. Miller, professor of biology at Brown University, delivered the keynote address at the University's 242nd Opening Convocation Tuesday, Sept. 6, 2005.
http://www.brown.edu/Administration/News_Bureau/2005-06/05-013m.html, National Human Genome Reserach Institue4, 2005, 'Scientists Analyze Chromosomes 2', <http://www.genome.gov/1351462>
14. New Genome Comparison Finds Chimps, Humans Very Similar At DNA Level,2005, Science Daily Magazine. <http://www.sciencedaily.com/releases/2005/09/050901074102.htm>
15. বন্যা আহমেদ, বিবর্তনের পথ ধরে, অবসর প্রকাশনা, ২০০৭

বন্যা আহমেদ, পেশায় কম্পিউটার প্রকৌশলী, গবেষক ও লেখক। ইতিহাস, দর্শন, সমকালীন রাজনীতি ও বিজ্ঞানের ইতিহাসে অপরিণীম কৌতুহল। আমেরিকায় বসবাসরত বন্যা আহমেদের বহু লেখা বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় পত্র-পত্রিকায় ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। অবসর প্রকাশনা থেকে বেরুনো বিবর্তনবিদ্যা সংক্রান্ত তার জনপ্রিয় গ্রন্থ - 'বিবর্তনের পথ ধরে' (২০০৭) পাঠকপ্রিয়তায় ধন্য। অনেকদিন ধরেই মুক্তমনার সাথে সংযুক্ত আছেন।